International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue III, April 2015, Page No. 1-4
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পশ্চিমবঙ্গে পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের সীমানা, বৈশিষ্ট্য ও ভাষিক মিশ্রণ সম্ভাবনা : একটি প্রস্তাবনা

স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী

Abstract

The people of the Murshidabad, Nadia, North 24 Parganas Districts and especially the Bongaon Sub-Division choose internal migration due the periphery, geographical location, and nature of work of the area belonging to the river East Bhagirathi. On the other hand, thanks to the development of well – connected elected electricity, well-established Panchayati Raj System (PRS) and greater opportunity of employment, people from different provinces come here. Consequently there has been a prospect of fusion of different dialects. This present article intends to show the prospect.

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা বলতে বুঝতে হবে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থেকে গঙ্গা যেখান থেকে হুগলী নাম নিয়েছে সেই পর্যন্ত। তারই পূর্ব পাড়। পূর্বে বাংলা দেশের সীমানা। এই অঞ্চলের জনবসতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা থাকলে অবাংলা ভাষাভাষী এবং আদিবাসীদের মিশ্রণ সম্পর্কে বোধ তৈরিতে সুবিধা হবে। ভাগীরথীর এই পূর্বপাড়ের সম্পূর্ণ জেলা মাত্র একটি। নদীয়া জেলা। মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহত্তর অংশ এবং এখনকার উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমার সম্পূর্ণ অংশ এবং বীজপুর থানা। অর্থাৎ কাঁচরাপাড়া।

জনগোষ্ঠির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ। গত শতাব্দীর নয়ের দশকের পর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ব্যাপক বিস্ফোরণ মানুষের সমস্ত ট্রাডিশনাল ধ্যানধারণার মধ্যে সত্য অর্থেই বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই প্রবন্ধকার যখন ঔপভাষিক মিশ্রণ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তখন তার ভাষিক বৈশিষ্ট্যের যে শ্রেণি বিভাগ ছিল আজ আর তেমন খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। যেমন শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ আবার তাদের প্রত্যেকের মধ্যে সচল এবং অচল উপবিভাগ। বয়স ভেদে উপবিভাগ ইত্যাদি। অচল যারা তারা সত্যি অর্থেই অচল ছিলেন। কিন্তু বৈদ্যুতিন যোগাযোগে বিস্ফোরণে গত শতাব্দীর শেষ দশকের পর এবং সর্বশিক্ষা বিস্তারের ফলে জনসংখ্যার মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'অচল' শব্দটাই এখন অচল।

জনবিন্যাসের চরিত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার জনগোষ্ঠির অর্দ্ধেকের বেশি মুসলমান। অর্থাৎ যারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সংখ্যালঘু, মুর্শিদাবাদ জেলায় তারাই সংখ্যাগুরু। এই জেলার মধ্য দিয়ে ভাগীরথী প্রবাহিত। জেলার মোট আয়তনের মোটামুটি ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা এবং অধিবাসী পূর্ব পাড়ে বাস করে। জনসংখ্যারও প্রায় ষাট শতাংশ মুসলমান। শিক্ষার হারেও মুর্শিদাবাদ জেলা এ রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির অন্যতম। ফরাক্কা ব্যারেজ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বহরমপুর শহরের বিস্তার এবং ঔজ্জ্বল্য ও ডোমকলের এডুকেশন হাব এ জেলার সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনীতিতে সামান্যই পরিবর্তন এনেছে। মুর্শিদাবাদ জেলা বস্তুত কৃষিনির্ভর এখনও প্রায় সামগ্রিকভাবেই। তবে একটা বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে সমগ্র দেশের সাথে সাথে মুর্শিদাবাদেও যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও বিপ্লব ঘটে গেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বপাড়েই ডোমকল এক সময়ের একটা গ্রামীণ থানা এখন একটি এডুকেশন হাব হিসেবে রাজ্যজুড়ে স্বীকৃতি পেলেও স্থানীয় জীবিকা প্রায় সম্পূর্ণতই কৃষি নির্ভর। অন্যদিকে কৃষিও ট্রাডিশনাল পথ ছেড়ে চাষে এবং শস্য সংগ্রহে বিপুল ভাবে যন্ত্রনির্ভর হতে শুরু করে। কৃষিকে উদ্বৃত্ত শ্রমিক সমস্যা কৃষি শ্রমিককে নতুন পেশার দিকে ঠেলে দিয়েছে। গত শতকের নয়ের দশকের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষ করে পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারতে নির্মাণ শিল্পের শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য কর্মের সন্ধানে পশ্চিম এশিয়ায় প্রবাসী হতে শুরু করে।

নদীয়া জেলা সম্পূর্ণই কৃষি নির্ভর। এক সময় কলকাতার উপকণ্ঠে শিল্পনগরী হিসেবে কল্যাণীর উত্থান ঘটেছিল। এই দশক থেকেই কল্যাণীতে শিল্প গৌণ হতে শুরু করে। নদীয়া জেলার রাণাঘাটে বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে রাণাঘাটে পাওয়ারলুম শিল্প গড়ে উঠে স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সময় থেকেই তার ক্ষয়ের প্রভাব স্থানীয় শ্রমের ক্ষেত্রে পড়তে শুরু করে।

নদীয়া জেলার উত্তর এবং পূর্বদিক মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন। জনবসতির মধ্যেও একটা সামঞ্জস্যের চরিত্র বর্তমান। নদীয়া জেলাতেও কৃষিনির্ভর এবং শ্রমনির্ভর শিল্পে যন্ত্র প্রয়োগ এবং ক্ষয়িষ্ণু শিল্প উদ্বৃত্ত শ্রমিক সৃষ্টি করেছে। ফলে এই জেলাতেও উদ্বৃত্ত শ্রমিক বর্হিমুখী হয়েছে বহু সংখ্যায়। পূর্বভাগীরথী তীরের বসতির মধ্যে একমাত্র উত্তর চব্বিশ পরগণার বীজপুর থানা অর্থাৎ কাঁচরাপাড়া এবং সংলগ্ন হালিশহর পুর এলাকাই সম্পূর্ণ শিল্প নির্ভর। রেলকারখানা এবং সেনাছাউনির জন্য তদুপরি

রেলকর্মীদের বিশাল কলোনী এলাকা এই অঞ্চলের অন্য এলাকা থেকে এক ভিন্ন মাত্রার সৃষ্টি করেছে। কাঁচরাপাড়া-কল্যাণী-কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট এরিয়া অথরিটির প্রকল্পাধীনও।

জনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে আলোচ্য অঞ্চল দেশবিভাগোত্তর উদ্বাস্তু জনবিস্ফোরণে প্রভাবিত। মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন বা বসতি আনুপাতিক সামান্য হলেও নদীয়া জেলা এবং উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ, বাগদা থেকে এই সংশ্লিষ্ট এলাকার ঠাকুরনগর পর্যন্ত তো বটেই প্রায় সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগণাই উদ্বাস্তু জনবিস্ফোরণ প্রভাবিত। আর উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বীজপুর থানা এবং অর্থাৎ কাঁচরাপাড়া দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পাঞ্চল। রেলকারখানার জন্য রেলকর্মীদের বিশাল কলোনী। রেলকর্মীদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অনুপাত অবাংলাভাষাভাষী। কাঁচড়াপাড়া রেলকারখানা পূর্বরেলের প্রভাবাধীন। স্বাভাবিকভাবেই এই কারখানায় বাংলাভাষাভাষী ছাড়াও পূর্বরেলের বিস্তার পর্যন্ত ঝাড়খন্ড ও বিহারের বাসিন্দা শ্রমিকরাও রয়েছেন। এদের সাধারণ কথ্য ভাষা ভোজপুরী ও মাগহী। ক্ষুদ্র একাংশ আদিবাসী। বাংলাভাষাভাষীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেরা, অবিভক্ত কালের বাসিন্দারা যেমন আছেন তেমনি পূর্বাবঙ্গাগত উদ্বাস্তুরাও আছেন।

অবাংলাভাষাভাষীদের এই এলাকায় অবস্থানের পশ্চাৎপট হলো, যখন হুগলী – ভাগীরথীর দুই তীরে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠল সেই সময় শ্রমিকদের প্রয়োজনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর শাসনাধীন বর্তমান বিহার ও ঝাড়খন্ডের নানা হতদরিদ্র এলাকা থেকে কায়িক শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে আসা হয়। কেউ এককভাবে কেউ পরিবার বা বান্ধবসহ কলকারখানার শ্রমিক হিসেবে চলে আসেন। এই আগমন নিরবিচ্ছিন্ন ছিল গত শতাব্দীর সাতের-আটের দশক পর্যন্ত বা তার অল্পাধিক পূর্ব পর্যন্ত। এদেরই কেউ কেউ যাদের কারখানায় কাজ জুটলনা বা কাজ চলে গেল তারা মালবহন করা, রিক্সাটানা, টেলাগাড়ী টানা বা অন্য তুচ্ছ কাজে নিযুক্ত হল। এভাবেই এই সব অবাংলাভাষাভাষীরা রেললাইন বরাবর স্টেশনে স্টেশনে কুলির কাজ বা রেলের তুচ্ছ কর্মসম্পাদনের জন্য ছড়িয়ে পড়েন। জমিদার প্রসার প্রচলনে পাইক লেঠেল এবং কোথাও কোথাও সম্পন্ন গৃহস্থের দ্বাররক্ষী নিযুক্ত হয়ে নিজেদের কর্মসংস্থান করেন। অন্য একদল সম্পন্ন অবাঙালিরা এসেছিলেন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। নবাব কার্যে। তবে তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাদের ভাষিক বৈশিষ্ট্য প্রায় শূন্য।

অন্যদিকে আদিবাসী জনগোষ্ঠি এই অঞ্চলের স্বাভাবিক জনগোষ্ঠি। পশ্চিমবাংলার আদিবাসী জনগোষ্ঠির বসতি সম্পর্কে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ার পরেই যে জেলাগুলিতে আদিবাসী জনবসতি জনসংখ্যার এক শতাংশ বা তার বেশি, নদীয়াজেলা তার একটি। এরপরই মুর্শিদাবাদ জেলা। উত্তর চব্বিশ পরগণার সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্বাভাবিক আদিবাসী সম্পর্কে কোন সরকারী তথ্য নির্দিষ্টভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়; তবে বাগদা ব্লকে আদিবাসীদের একাধিক ক্ষুদ্রবসতি সম্পর্কে এই প্রবন্ধকার অবহিত। তেমনি কাঁচরাপাড়া এবং রেলের অন্যান্য বিভাগে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত কয়েকশ আদিবাসী পরিবার রয়েছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সক্রিয়তা এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থা এবং পেশাগত ও গোষ্ঠিগত চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিটি পাড়ার সাথে সহজ যাতায়াত সর্বঋতুতে ব্যবহার সম্ভব রাস্তা, পঞ্চায়েতের সর্বনিম্ন একক অঞ্চলকে যেমন যুক্ত করেছে তেমনি যুক্ত হয়েছে আন্তঃঅঞ্চল, আন্তঃথানা, ব্লক সহ শহর, সড়ক রেলপথ নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনীয় আধুনিক উপকরণ সংগ্রহে স্বনিযুক্তিতে আগ্রহ বেড়েছে। পথ সহজগম্য হওয়ায় যানবাহনের সুযোগ নেওয়া সহজলভ্য হয়েছে। ফলে সর্বশ্রেণির মানুষ সচল হয়ে পড়েছে। গত শতাব্দীর আট বা নয়ের দশকেও যে শ্রেণির এবং যে বয়সের মানুষেরা স্বাভাবিক অচল হতেন এখন সেই সংখ্যাটা অতিনগণ্য হয়ে পড়েছে।

পূর্বভাগীরথী তীরের এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের অবাংলাভাষাভাষীদের ভাষিক বৈশিষ্ট্যে এই সব বিষয়গুলির প্রভাব অস্বীকার করা দুঃসাধ্য এবং প্রতিটি গোষ্ঠি এবং প্রতিটি মানুষের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করলে কোন সাধারণ সূত্রে পৌঁছান কঠিন ব্যাপার। অথচ এই বৈশিষ্ট্যের একটা সাধারণ সূত্র অবশ্যই রয়েছে। সেই সাধারণ সূত্রকেই ভাষাতাত্ত্বিক প্রকরণবিদ্ধ করার একটা চেষ্টা করা যেতেই পারে। সে চেষ্টার ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব হবে খুবই উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক কালের সূচনা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিহার পূর্বভারতের সাথে অঙ্গাঙ্গি সংপৃক্ত। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয় এর শুরু আর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজদৌলার পতনের সময়েও এর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এমনকি ইংরেজ রাজত্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বলতে বোঝাত এই সম্পূর্ণ বিভাগকেই। বিহার এবং বাংলার বিযুক্তি লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের পরিণতি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। কিন্তু বিহার বাংলার প্রশাসনিক সম্পর্ক ছেদ হয়। বস্তুত এর পরেই বিহারে হিন্দির আগ্রাসনের সূত্রপাত। মাগহী, ভোজপুরী ও মৈথিলীর লিপি দেবনাগরীতে স্বীকৃতি পাওয়ার পরই, বিহারীভাষাকে খড়িবোলির একটা উপভাষায় পরিণত করার সহকারী প্রয়াস চলছে। তার তীব্রতা বেড়েছে স্বাধীনতার পর থেকে। মাগহী উপভাষার দুর্ভাগ্য দুহাজার বছরের ঐতিহাসিক অবহেলার পরিণামে এই ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে লৌকিক ভাষা আছে, কিন্তু লৌকিক সাহিত্য এমন শক্ত জমি খুঁজে পায়নি, যার দ্বারা সে খড়িবোলি উপভাষার খবরদারির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ভোজপুরী উপভাষা মাগহীর তুলনায় অল্প ব্যতিক্রম হলেও তাকেও হিন্দির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে ব্যতিক্রম শুধু মৈথিলী। শুধু সংক্ষেপে এ বলা যায় যে মৈথিলীর সমৃদ্ধি খড়িবোলিরও পূর্বে। মৈথিলীকে হিন্দির উপভাষা বলে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রমাণ করে হিন্দির চেয়ে মৈথিলীর সাথে বাংলাভাষার সম্পর্ক অনেক বেশি নিবিড়। পশ্চিমবাংলায় আগত হিন্দিভাষী অঞ্চলের মানুষের প্রায় পচানব্বই শতাংশই বিহারী। এদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনেরও বেশি আবার ভোজপুরী ঔপভাষিক এলাকার বাসিন্দা। বাকিদের গরিষ্ঠ মাগহী এবং এক নগণ্য অংশ মাত্র মৈথিলী ঔপভাষিক এলাকার বাসিন্দা। সুতরাং প্রভাবের বিচারে ভোজপুরী উপভাষাকেই তাই বেছে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় আগত এই এলাকার (ভোজপুরী) মানুষের উপর বাংলা ভাষার ঔপভাষিক প্রভাব আলোচনার

পূর্বে, সেই জন্য প্রয়োজন এই এলাকার কোন শ্রেণির মানুষ কেন এবং পশ্চিমবাংলার কোথায় এসেছেন। কোন সময়ে এসেছেন। তাদের বয়স এবং শিক্ষা। শিক্ষা শুধু স্বাক্ষরতাই নয়, শিক্ষার মানও। আর সর্বোপরি হিন্দীর সর্বগ্রাসী প্রভাব তাদের নিজস্বভাষার কতখানি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে দিয়েছে। সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এরা সমাজের কোন শ্রেণিভুক্ত। জীবনযাত্রার মান এবং জীবিকার বৈশিষ্ট্যও তাদের ভাষিক বৈশিষ্ট্যে প্রভাব বিস্তার করেছে।

এই সাথে অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পশ্চিম বাংলার কোন অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করেছেন। তাদের এই বসতির চরিত্র। যে এলাকায় তাদের অবস্থান সেই এলাকায় তাদের জীবিকার চরিত্র। পশ্চিমবাংলার ঐ এলাকায় অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষিক বৈশিষ্ট্য। তবু পশ্চিমবাংলায় সামগ্রিকভাবে হিন্দিভাষী এলাকার মানুষ কোথায় কোথায় এসেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দরকার। যে কোন স্থানেই সাধারণতঃ যে কয়েকটি কারণে অন্য অঞ্চল থেকে মানুষ আসে তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে জীবিকার সংস্থানের দাবী। এছাড়াও সাম্প্রদায়িক কারণ, সে সাম্প্রদায়িক কারণ ধর্মীয়, দেশভাগ, উপজাতীয় সংঘর্ষ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি নানা ধরণের হতে পারে। তবে পশ্চিমবাংলায় প্রধানতঃ হিন্দিভাষী এলাকার যে সমস্ত মানুষ এসেছেন তাদের প্রধানতম এবং একমাত্র কারণ জীবিকার প্রয়োজনে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলার বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার ঢাকা – মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতা ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকেন্দ্র। অবশ্য আরও পিছিয়ে গিয়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড়ের রাজা শশাঙ্কর সময় থেকেই পশ্চিমবাংলায় সৈনিকবৃত্তি এবং ব্যবসায়িক কারণে বিহার থেকে জীবিকার সন্ধানীদের আগমন ঘটেছে। এর ব্যাপক ব্যাপ্তি ইংরেজশাসনে শিল্পায়ণ শুরু হবার পর থেকেই। এই সময়কাল থেকে স্বাধীনতা – উত্তর বর্তমান সময় কাল পর্যন্ত। এই সমকালে হুগলী নদীর দুই তীরে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। কলকাতা ক্ষুদ্র ব্যবসায় কেন্দ্র থেকে বিশাল মহানগরী হয়েছে। হয়েছে পূর্বভারতের (এই সেদিন পর্যন্ত) একমাত্র বন্দর। দেশের রাজধানী। রেল লাইন স্থাপনে যোগাযোগের সুবিধা বৃহত্তম ব্যবসায় কেন্দ্রগুলির অন্যতম। আসানসোল ও দূর্গাপুরে কয়লাখনি এবং লৌহ ইস্পাত কারখানা। হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণায় পাট শিল্পের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। ফলে ব্যাপক ভাবে শ্রমিক নির্ভর হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে বাংলাভাষীরা এই শিল্পায়ণে এবং প্রশাসন পরিচালনায় যত না কায়িক শ্রম নির্ভর শ্রমিক পেশায় আকৃষ্ট হয়েছে, শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ বেশি পেয়ে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে প্রশাসনিক এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই কায়িক শক্তি নির্ভর কর্মকে জীবিকা হিসেবে এড়িয়ে চলেচে। ফলে সবচেয়ে কাছের এলাকা বিহার থেকে শিল্প-শ্রমিক এসেছে। বলা যেতে পারে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে। দেখা গেছে এক সময়ে প্রায় সত্তর শতাংশ শিল্প কারখানার কর্মীই ছিলেন হিন্দিভাষী। এমনকি বর্তমান সময়েও কলকাতা পুরসভার একটি বিশেষ পদ নব্বই শতাংশই অবাঙালি হিন্দিভাষী। অন্যান্য পুরসভাগুলির চিত্রও ব্যতিক্রম নয়।

এই প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা কেবলমাত্র ভাগীরথী পূর্বতীরস্থ এলাকা। তাত্ত্বিকভাবে ভাগীরথী-হুগলী নদী এবং পদ্মার দোয়াব অঞ্চল হিসেবে একে চিহ্নিত করলেও দেশ ভাগ জনিত এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। যার মধ্যে কলকাতা শহরকে আবার বাইরে রাখা হয়েছে। ফলে কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া, হাজীনগর, নৈহাটী, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর, টিটাগর, কামারহাটী, দমদম থেকে বারুইপুর, ক্যানিং, ফলতা, বজবজ এই শিল্পাঞ্চল এবং ব্যবসায় কেন্দ্র হিসেবে মুর্শিদাবাদের লালগোলা, জিয়াগঞ্জ, নদীয়ার পলাশী, নাকাশীপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের পাঠ, চিনি, আখ প্রভৃতি ব্যবসা কেন্দ্রে জীবিকার সন্ধানে হিন্দিভাষী মানুষেরাই এর আওতাভুক্ত। এর সাথে যোগ করতে হবে রেল সহ পরিবর্তন এবং ব্যক্তিগত পেশাগুলিকে। পশ্চিমবাংলায় আগত অবাংলাভাষী এবং আদিবাসী মানুষের উপর বাংলা উপভাষার আঞ্চলিক প্রভাব এবং তার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে এর থেকেই ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, শাব্দিক এবং অর্থগত বিশ্লেষণে উপনীত হওয়া যায়।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থঋণ :

১। মোরশাদ আবুল কালাম, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
২। সেন দীনেশ চন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১
৩। গুপ্ত নলিনীকান্ত, চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা, শৃণ্বন্তু, কলকাতা, ১৯৭৫
৪। মুসা মনসুর, বাংলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা, ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, মুক্তাধারা, ঢাকা, ১৯৮৪
৫। মনিরুজ্জামান, ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
৬। শ' রামেশ্বর, সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলিকাতা, ১৯৮৪
৭। ভৌমিক প্রবোধ কুমার, উপজাতির কথা, কলিকাতা
৮। সিংহ মানিকলাল, রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, কলিকাতা
৯। সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৩৫৩ (বা)
১০। ইসলাম রফিকুল, উপভাষা তত্ত্ব, ঢাকা, ১৯৭০

English

1. Majumder R.C., History of Bengal, 1705-1757
2. Das A.K. & Ors, Hand book on S.C. & S.T. Tribes of W.B., Special series no. 8, Cal., 1966
3. Bell R.T., Sociolingguistics, B.T. Balsfood Ltd., 1976
4. Pride J.B., The Socio meaning of Language, 1971

5. Language, L. Bloomfield, Delhi, 1963
6. Catford J.C., Census of India, Series 22 & sr. 23 W.B.
7. District Census Handbook, Nadia, Mursidabad & 24 Pgs 9 (N & S) – 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 (From Electronic Media)
8. Chatterjee Suniti Kumar, Linguistic in India, Cal., 1928